সান্তুআ SANTUA

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা | কের পুজা সংকলন | শ্রাবণ ১৪০১ ত্রিপুরাব্দ ১৯৯১ ইং

সম্পাদকীয় নিবেদন

'কের' শব্দের অর্থ সংযমী হওয়া, কোন অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য ব্রত পালন করা। কেরপূজা ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর একটি প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান। রোগ শোক, দুর্ভিক্ষ, দুর্যোগ প্রভৃতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ত্রিপুরারা কেরপূজার আয়োজন করে থাকে। এঅনুষ্ঠান মূলতঃ গ্রামভিত্তিক, যাতে কোন নির্দিষ্ট গ্রামের বাসিন্দারা সবাই সমান ভাবে অংশ নেয়। তবে গ্রামের চাইতে বৃহত্তর পরিধিতেও কেরপূজা হতে পারে। যেমন এক সময় ত্রিপুরা মহারাজারা গোটা রাজ্যের মঙ্গলার্থে কেরপূজার আয়োজন করতেন। তেমনি জমাতিয়ারা হদা ভিত্তিক অর্থাৎ গোটা সম্প্রদায়ের জন্য কেরপূজার আয়োজন করে থাকেন। এমনি একটি বাৎসরিক আয়োজন হল শাওন পূজা, যেখানে অভাব অনটন থেকে গোটা সমাজকে রক্ষা করার জন্য মাতাইদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানানো হয়। বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কেরপূজার আয়োজন করা যায়, তবে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে শ্রাবণ মাসের গোড়ার দিকেই সাধরণতঃ এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। যখন যে উপলক্ষেই অনুষ্ঠিত হোক না কেন, কেরপূজা সামাজিক সংহতির প্রকাশ ও বিকাশের একটা শক্তিশালী উপায় নিঃসন্দেহে। বর্ষামৌসুম হল ধান রোয়ার সময়। জুমের ফসল ওঠারও দেরী থাকে এসময়। এসময়ে গ্রামাঞ্চলের ত্রিপুরারা ব্যাপক অভাব অনটনের সম্মুখীন হয়। শাওন কের পূজা এই দুঃসময়ে সমাজের সবাইকে পরস্পরের কাছে আনে; সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মনোভাব জাগ্রত করে সবার মধ্যে। এই শাওন পূজা উপলক্ষেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রকাশনা উৎর্সগীকৃত।

'সান্তুআ' নামে ত্রিপুরা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক একটি অনিয়মিত সাময়িকী প্রকাশের লক্ষ্যে এটি আমাদের প্রথম প্রয়াস। একটি বিশেষ অভাববোধ দ্বারা তাড়িত হয়ে সীমিত সাধ্য নিয়েই আমরা কয়েকজন এ উদ্যোগ নিয়েছি। ত্রিপুরা সমাজে সার্বিকভাবে লক্ষ্য করা যায় সংহতির অভাব, ভবিষ্যৎমুখী ও আশাবাদী চিন্তাভাবনা কর্মতৎপরতার অভাব, সুষ্ঠু দিক নির্দেশনার অভাব। সময়ের অভিঘাতে আমরা অনেকেই বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন, বিভ্রান্ত অবস্থায় আছি। কেরপূজার লগ্নে আমরা কামনা করব এ অবস্থার যেন অবসান ঘটাতে পারি আমরা সবাই মিলে। আর এ ক্ষেত্রে 'সান্তুআ' যদি সমাজকে নুতন পথে নিয়ে যেতে সামান্যও ভূমিকা রাখতে পারে, তাহলে আমাদের শ্রম আর পত্রিকার নাম সার্থক হবে ('সান্তুআ' শব্দের অর্থ পথিকৃৎ বা পথপ্রদর্শক। ত্রিপুরা গ্রামবাসীদের অপরিচিতস্থানে তীর্থ যাত্রায় যেতে যারা সাহায্য করে থাকেন, তাদেরকেই সান্তুআ নামে ডাকা হয়)।

এ সাময়িকী প্রকাশে অনেকেই শুরু থেকে উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন, আর্থিক ও অন্যভাবে সহায়তা করেছেন। তাদের সবার প্রতি জানাচ্ছি অজস্র ধন্যবাদ ও আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

সম্পাদনায়ঃ প্রশান্ত ত্রিপুরা ও শক্তিপদ ত্রিপুরা। সান্তুআ আহবায়ক কমিটি কর্তৃক খাগড়াছড়ি থেকে প্রকাশিত
কম্পিউটার কম্পোজ ও প্রিন্টিংঃ ম্যাকটাচ্ কম্পিউটার্স, ৩০ নজির আহম্মদ চৌধুরী রোড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

শুভেচ্ছা মূল্যঃ ৭.০০ টাকা

ত্রিপুরা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে কিছু কথা

ব্রজনাথ রোয়াজা

মাতৃভাষা সবার কাছে অতি মধুর। শত দুঃখকষ্ট, জ্বালা যন্ত্রনার মধ্যেও মায়ের শিখানো বুলিতে আমাদের মন প্রান শীতল হয়ে যায়। প্রত্যেক জাতির নিজস্ব মাতৃভাষা আছে। মনোভাবের পূর্ন আদান – প্রদান মাতৃ ভাষার মাধ্যমেই হয়। শিশুর মনে বোধ শক্তি ও ধারন শক্তিকে মাতৃভাষা যত সহজে, যত অল্প সময়ে জাগাতে পারে, অন্য ভাষা তা পারে না। মাতৃভাষার সাহায্যে ভাবের আদান প্রদানের ফলে ভাষার সাথে তাদের যে পরিচয় হয়, তাতে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই মাতৃভাষার কার্যকরী জ্ঞান লাভ সম্পন্ন হয়। শরীরের পুষ্টির জন্য পানাহার যেমন অত্যাবশ্যক, মনোবৃত্তি বিকাশের পক্ষে মাতৃভাষাও সেইরূপ একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান।

ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা হল ককবরক। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে বা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বাংলাকে দ্বিতীয় মাতৃভাষা হিসাবে গ্রহন করে আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনে কাজে লাগাচ্ছি। আর এ ভাষা দিয়ে আমরা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হচ্ছি। মাতৃভাষার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন ভাষাচর্চার প্রয়োজনীয়তা আছে বইকি। এতে লজ্জা বা অগৌরবের কিছুই নেই। থাকতে পারে না। বরং একাধিক ভাষা আন্তরিকতার সাথে অনুশীলন ও অনুধাবনের মধ্যে উদারতা ও প্রগতিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু অপরের ভাষা চর্চা করতে গিয়ে আমরা যদি নিজেদের ভাষা, যা আমরা মায়ের কোলে থেকে শিখি তা, ভুলে যাই, তবে আমাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য একেবারেই থাকে না। তাই আমার মতে অপরের ভাষা চর্চা করে জ্ঞান – বিজ্ঞানে শিক্ষা পাওয়ার পাশাপাশি আমাদের মাতৃভাষা কক্‌বরককেও উন্নত করতে সচেষ্ট হতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের অবহেলিত, লুপ্ত প্রায় কক্‌বরক ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি গভীর ভালবাসা ও নিষ্ঠার সাথে তাকানো। সেগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা। পল্লী গ্রামের অনেক ত্রিপুরা বুড়োবুড়ীদের মুখে মূল্যবান তত্ত্বকথা, হিতোপদেশ, গাঁথা, গান, রূপ কথা, কিংবদন্তী, প্রবাদ, ছড়া, ধাঁধা ইত্যাদি ছড়িয়ে আছে। এ গুলো আধুনিক শিক্ষা ও রুচির কাছে অপাংক্তেয় হয়ে পল্লীর বুকে পরিত্যক্ত হয়ে রয়েছে। পুরনো বুড়োবুড়ীদের সাথে আধুনিক শিক্ষাভিমানী নরনারীদের জীবনের দূরত্ব বেড়ে গেছে। ফলে আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উপাদান গুলি বিস্মৃতির শিকার হচ্ছে। গবেষণা করলে দেখতে পাওয়া যেত যে ত্রিপুরাদের ভাষা ও সাহিত্য শুধু উৎকৃষ্টই নয়, নানা অর্থে ও তাৎপর্যে মন্ডিত এক আশ্চর্য সম্ভার বিশেষও।

আমাদের উচিত ত্রিপুরা লোক সাহিত্যের সব ঐতিহ্য তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করা এবং এগুলোকে বাংলায় অনুবাদ করে দেশের বৃহত্তর অংশের কাছেও জনপ্রিয় করে তোলা। আর এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন হবে একটা অনুসন্ধানকারী কমিটি গঠন করা। ইউরোপ ও আমেরিকার দৃষ্টান্ত গ্রহন করে folklore society গড়ে তুলতে হবে এবং society দ্বারা প্রচার, আলোচনা ও সার্বিক আবশ্যকীয় কাজ করতে হবে। এসবের পাশাপাশি ককবরকের লিখিত চর্চা ও আধুনিক কক্‌বরক সাহিত্য গড়ে তোলার কাজও করতে হবে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে কক্‌বরকের আদর্শ লিখিত রূপ চালু হয়েছে এবং সেখানে এই ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত কক্‌বরক-এ শিক্ষাদান চলছে। বাংলাদেশে ত্রিপুরা উপজাতি শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংসদ (বর্তমানে ত্রিপুরা কল্যান সংসদ – সম্পাঃ) অনুরূপ উদ্যোগ নিতে পারে। আর এক্ষেত্রে সরকারী সহায়তার ও প্রয়োজন হবে। বাংলাদেশের অনগ্রসর ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য সরকারী সহায়তার যে ধারা চলছে, তা অব্যাহত থাকবে এবং ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে বলেই আশা করা যায়।

(শ্রী ব্রজনাথ রোয়াজা নানিয়ারচর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। কবি, প্রাবন্ধিক। ককবরকে এবং বাংলায় সাহিত্য চর্চা করেন।)

মদঃ ভালবাসার চাইতেও শক্তিশালী একটি বিষ

সাঙদারি

একঃ দু'জন মদ্যাসক্ত ব্যক্তির বর্ণনা দিয়ে আমার এ আলোচনা শুরু করব। (তাদেরকে অনেকে হয়ত চিনতে পারবেন, আশা করি এতে কেউ ক্ষুন্ন হবেন না। ব্যক্তি বিশেষকে হেয় বা বিব্রত করার কোন উদ্দেশ্য আমার নেই, বরং এ দু' জনের মধ্যে গোটা ত্রিপুরা সমাজের যে একটা করুণ বাস্তবতা প্রতিফলিত, তাই তুলে ধরতে চাই।) প্রথমজনের নাম ধরা যাক ত-ফা। যখনই পথে দেখা হয়, তাকে দেখতে পাই নেশায় টলছে, প্রলাপ বকছে। একবারই তাকে অনেশাগ্রস্ত দেখেছিলাম, খুব সকালে। তাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখতে এতই অভ্যস্ত ছিলাম যে এদিন তাকে আমার অস্বাভাবিক লেগেছিল, তার অপ্রতিভ আত্মসচেতন রূপ দেখে এক ধরনের করুনাও হয়েছিল তার উপর। অবশ্য এর এক ঘন্টা পরেই সে তার 'স্বাভাবিক' অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় জনকে ডাকব দ-ফা বলে। তাঁরও প্রায় একই অবস্থা। কথা প্রসঙ্গে আমি তাঁকে জিগ্যেস করেছিলাম একদিন, আতা, তুমি মদ ছাড়া থাকতে পার না? দ-ফার জবাব, সকালে এক বোতল আর সন্ধ্যায় আর এক বোতল না হলেই নয় তাঁর। পেটে মদ না পড়লে হাত পা কাঁপতে থাকে।

দু' জনই বাইরে খুব নিরীহ। বাংলাছবির মাতাল লম্পট বা দুর্বৃত্ত চরিত্রদের সাথে তাদেরকে মেলানো যায় না। তাদের দেখে রাগ হয় না। বরং দুঃখ হয়। রাগ হয় বইকি, নিজের উপর, সমাজের আর দশজনের উপর। আমাদের চোখের সামনে কিভাবে ত-ফা আর দ-ফার মত লোকেরা মদের কাছে তাদের জীবন, তাদের সন্তানদের ভবিষ্যত, বিকিয়ে দিল?

আমার স্কুলজীবনের শুরুতে ত-ফা আমার সহপাঠী ছিল। আর দ-ফা ছিলেন আমার শিক্ষক। তাই তাদের এই পরিণতি আমার কাছে আরও বেশী পীড়াদায়ক। আর যখন তাদের সন্তানদের দিকে তাকাই, দেখতে পাই দারিদ্র্য, হতাশা ও অভিবাকত্বহীনতার অসহায় শিকার তারা এবং কেউ উদ্যোগী না হলে সময়ে তারাও প্রায় নিশ্চিত ভাবেই মদের হাতে নিজেদের ছেড়ে দেবে। ত-ফার ছেলে ত-কে আমি একজন ভাল ছাত্র হিসাবে জানতাম। তার মধ্যে সৃজনশীলতার আভাসও দেখেছিলাম- একটা শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার সূত্রে।

একদিন খবর নিয়ে জানতে পারি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গন্ডী পেরিয়েই তার স্কুলে পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। যে দ-ফা একদিন নিজে শিক্ষক ছিলেন, দেখলাম তাঁর দু'জন কনিষ্ঠ সন্তান অক্ষর জ্ঞান পর্যন্ত পায়নি, অথচ তাদের পড়শুনার বয়স পেরিয়ে গেছে অনেক আগে। ত-ফা ও দ-ফার পরিবারের অবস্থা আর বিশদভাবে বলার কিছু নেই। যে কেউই তা কল্পনা করে নিতে পারেন।

ত-ফা ও দ-ফা দু'জনেরই সঙ্গতি ছিল সন্তানদের স্কুলে পড়ানোর। কিন্তু সন্তানদের প্রতি তাদের যতটুকু যত্ন, মনোযোগ ও ভালবাসা দেখানো উচিত ছিল- তা তারা দেখতে পারে নি, কারণ তাদের শিরায় উপশিরায় ঢুকে গেছে ভালবাসার চাইতেও শক্তিশালী একটি উপাদান, একটি বিষ- মদ। প্রকৃত পক্ষে, ত-ফা ও দ-ফা রীতিমত অসুস্থ। মদের কবল থেকে তাদেরকে উদ্ধার করতে হলে ডাক্তারী চিকিৎসা অপরিহার্য হতে পারে।

এতো গেল মদ্যাসক্তির একটা চূড়ান্ত রূপ। এরকম উদাহরণ প্রায় প্রতিটি ত্রিপুরা গ্রামেই মিলবে। কিন্তু শুধু ত-ফা ও দ-ফাদের মত লোকদের শরীরে নয়, আমাদের গোটা সমাজ দেহে চলছে মদের মারাত্মক বিষক্রিয়া। ত্রিপুরাদের মধ্যে ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-শিক্ষা বঞ্চিত, তরুন-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষ সবাই যেভাবে কমবেশী মদ্যাসক্ত, সে অবস্থাকে সামগ্রিক আত্মহননের প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। আমাদের এই আত্মঘাতী প্রবণতাকে রোধ করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। আর এর জন্য চাই জীবনমুখী, আশাবাদী ও সংগ্রামী চেতনা এবং সংকল্পের ব্যাপক প্রসার। আশার বিষয়, এই চেতনা ও সংকল্প তরুন প্রজন্মের প্রতিনিধিদের মধ্যে বিদ্যমান। নীচে তারই একটা উদাহারণ দেওয়া গেল।

দুইঃ এ বছর বৈসু উপলক্ষে খাগড়াছড়ির বৈসু- উদ্‌যাপন কমিটির তরুন সদস্যরা একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছিল। কমিটি একটি রচনা প্রতিযেগিতার ব্যবস্থা করেছিল যার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল নিম্নোক্ত প্রস্তাবনাঃ "মদ্যপান ত্রিপুরা সমাজের অনুন্নতির অন্যতম কারণ"। বিভিন্ন স্কুল কলেজের মোট নয়জন ছাত্রছাত্রী রচনা জমা দিয়েছিল, তারা হল- বরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, গীতা দেববর্মন, প্রতিমারানী ত্রিপুরা, মনিকা ত্রিপুরা, প্রভাত জ্যোতি ত্রিপুরা, সুচরিতা রোয়াজা, চিত্রা রোয়াজা, পুষ্পেশ্বর ত্রিপুরা, ও কিশোর কুমার ত্রিপুরা। তাদের সবার রচনায় যে কটি বিষয়ে জোর ঐক্যমত প্রকাশ পেয়েছে সেগুলোর সার সংক্ষেপ এখানে দেয়া হলঃ

১। চিরাচরিত প্রথানুযায়ী ত্রিপুরাদের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে মদ এখনও একটি অপরিহার্য উপাদান। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মদের আশীর্বাদ না পেলে একজন ত্রিপুরার চলে না। আবুয়াক সুনায় থেকে শুরু করে বিবাহোৎসব, শ্রাদ্ধ - ক্রিয়া - সবখানেই মদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক বলা চলে। কিন্তু মদের ব্যবহার শুধু সামাজিক অনুষ্ঠানদিতেই আর সীমাবদ্ধ নেই, সব শ্রেনীর ত্রিপুরাদের মধ্যে দৈনিক ভিত্তিতে মদ্যপান চালু হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় মদকে একটি সম্মান জনক সামাজিক পানীয় হিসাবে আর গ্রহন করা উচিত নয়।

২। মদের অপব্যবহারের ফলে আসক্তরা যেমন নিজেরা দৈহিক, মানসিক ও আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি তাদের পরিবারে তথা গোটা সমাজে মদের ক্ষতিকারক প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। মদের কারণে বা মদকে উপলক্ষ করে দেখা দেয় পারিবারিক অশান্তি,আত্মীয় পড়শীদের সাথে বিবাদ, এক কথায় সামাজিক অনৈক্য এবং বিশৃঙ্খলা।

৩) ত্রিপুরাদের নেতৃস্থানীয় ও শিক্ষিত অংশ মদের এই অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার পরিবর্তে নিজেরাই নেশায় বিভোর। মদের অভিশাপ থেকে গোটা সমাজকে মুক্ত করতে হলে এদের নিজেদেরকে প্রথম আসক্তি থেকে মুক্ত হতে হবে।

৪) যে সমস্ত কারণে মানুষ মদ্যাসক্ত হয়ে পড়ে - হতাশা, সঙ্গদোষ, সর্বোপরি মদের সামাজিক পশ্রয় - সামাগ্রিক ভাবে এই কারণ গুলোর মোকাবেলা করতে হবে।

৫) যে সমস্ত দরিদ্র পরিবার ও বৃদ্ধা বিধবারা মদ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে, তাদেরকে বিকল্প পথের সন্ধান দিতে হবে

৬) তরুণ প্রজন্মের সামনে মদ্যাসক্তি মুক্ত একটি সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার আদর্শ তুলে ধরতে হবে আর তরুনদের সংকল্পবদ্ধ হয়ে এই নূতন সমাজ গড়ার সংগ্রামে নামতে হবে।

তিনঃ ত্রিপুরাদের জুমভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় একসময় হয়ত মদের একট সমর্থনযোগ্য স্থান বা ভূমিকা ছিল। কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতিতে যে ভাঙন দেখা দিয়েছে; অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সবক্ষেত্রে আমরা যে বিপর্যয়ের মধ্যে আছি, মদ্যাসক্তির ব্যাপক প্রসারের ফলে এ বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠা তো দুরে থাক, আত্ম বিধ্বংসী একটা আবর্তে আমরা আরও বেশী করে ডুবে যাচ্ছি।

সমাজতাত্ত্বিক বিচারে অবশ্য মদ্যাসক্তির প্রসার কোন সমাজের অবনতির মূল কারণ নয়, বরং বিভিন্ন কারণে সমাজ সংস্কৃতিতে ভাঙন দেখা দেওয়ার ফলেই সচরাচর এ লক্ষণ দেখা দেয়। কিন্তু এটাও ঠিক, মদ্যাসক্তির প্রসার সে ভাঙনকে ত্বরান্বিত করে। এরকম উদাহারন অনেক আছে। যেমন আমেরিকার মূল অধিবাসীদের বংশধরেরা, যারা Native American নামে পরিচিত, তাদের মধ্যে মদ্যাসক্তি একটা বড় সমস্যা। এ অবস্থা সবসময় ছিল না। Anastasia M. Shkllnyk নামের এক গবেষক তাঁর *A Poison Stronger Than Love* * গ্রন্থে কানাডার একটি পুর্নবাসন পল্লীতে বসবাসরত Ojibwa সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা কিভাবে মদ্যাসক্তির মাধ্যমে নিজেদের ধ্বংস ত্বরান্বিত করছে তার বর্ণনা দিয়েছেন। এ পল্লীর লোকদের যখন তাদের পুরনো বসতিগুলো থেকে সরকারী উদ্যোগে নূতনস্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়, তখন থেকেই মদ্যাসক্তির ব্যাপক প্রসার এদের সমাজে দেখা দেয়। পাশাপাশি দেখা দেয় ব্যাপক হারে আত্মহত্যা, খুন খারাবি, সন্তানদের প্রতি অবহেলা। বাইরের আগ্রাসী শক্তিকে প্রতিরোধ করতে না পারা থেকে যে ক্ষমতাহীনতা ও অসহায়ত্বের বোধ এবং পরনির্ভরশীলতা জন্ম নেয়, সেসবই আত্মঘাতী রূপ নিয়ে এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এটা মন্দের ভাল য়ে ত্রিপুরাদের অবস্থা এখনও এত খারাপ পর্যায়ে পৌঁছায় নি, কিন্তু এখনই সচেতন ও সক্রিয় না হলে আমাদেরও ফেরার পথ থাকবে না।

ত্রিপুরাদের সমস্যা বহুবিধ। বহুযুগের রাজনৈতিক বঞ্চনার ফলে অর্থনৈতিকভাবে আমরা ক্রমশঃ দুর্বল থেকে দুর্বলতার হয়ে পড়েছি। শিক্ষার প্রসার আমাদের মধ্যে ঘটেনি, আমাদের

সামাজিক ঐক্য অটুট নেই। কিন্তু এ অবস্থার জন্য ইতিহাস বা ভাগ্যকে দোষ দিয়ে বসে থাকলে চলবে না। আমাদের মধ্যে আনতে হবে সংগ্রামী মনোভাব, বিপ্লবী চেতনা, আর অনমনীয় সংকল্প – যে আমরা একটা সুস্থ, স্বাভাবিক ও উন্নত সমাজ হিসাবে আবার মাথা তুলে দাঁড়াবই যে কোন মূল্যে। বিকেল হলেই বা বন্ধু বান্ধব জুটলেই নেশায় বুঁদ হয়ে বসে থাকলে নিজেদের ভবিষ্যত, সমাজের ভবিষ্যত, নিয়ে ভাবার কোন অবকাশই আমরা পাব না। সময় হয়েছে জীবনকে সত্যিকার অর্থে ভালবেসে, আগামী প্রজন্মের কথা ভেবে, মদ নামক বিষকে সমাজ দেহ থেকে ঝেড়ে ফেলার। আমাদের মনে রাখতে হবে সমাজ পরিবর্তনের পূর্বশর্ত হচ্ছে আত্মশুদ্ধি। আমাদের প্রত্যেককে প্রথমে নিজের সাথে যুদ্ধ করে নবচেতনায় উজ্জীবিত হতে হবে। আমরা যারা বয়সে তরুন যারা ভবিষ্যতের দিকে তাকাই জীবনমুখী, আশাবাদী ও সংগ্রামী চেতনা দিয়ে, আমাদেরই হতে হবে নূতন সমাজের অভিযাত্রায় অগ্রপথিক – সান্তুআ।

পোষ্টস্ক্রিপট্ঃ এ নিবন্ধ লিখে শেষ করার পর খবর এল, সম্প্রতি গাছবান গ্রামের এক ব্যক্তি অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে মারা যায়। আমাদের সমাজে মদ্যাসক্তির বিরুদ্ধে সচেতনতা ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা যে কত জরুরী হয়ে পড়েছে, এই দুঃসংবাদ যেন তাই মনে করিয়ে দেওয়ার অপেক্ষায় ছিল। স্মরন করা যেতে পারে, বৈসুর সময়ও ঠাকুর ছড়ায় এক ব্যক্তি নেশগ্রস্ত অবস্থায় পুকুরে ডুবে মারা যায়। জুলাই ২১, ১৯৯১

* এ নিবন্ধের নামকরন উপরোক্ত গ্রন্থের নামানুসারেই করা হয়েছে। আগ্রহী পাঠকের জন্য পুরো রেফারেন্স এখানে দেওয়া হলঃ Anastasia M. Shkllnyk, *A Poison Stronger Than Love: The Destruction of an Ojibwa Community.* New Heaven: Yale University Press 1985.

বান্দরবান জেলার ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবন

অসাই ত্রিপুরা

সবুজ, শ্যামল, ছায়াঘন তরঙ্গায়িত পার্ব্বত্যভূমি আর দোয়েল, কোকিল, ময়না ডাকা স্নিগ্ধতায় ভরপুর বাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিন সীমান্তের পার্ব্বত্যজেলা মায়াময় বান্দরবান। বিচিত্র এবং অপরূপ প্রকৃতির প্রতিটি ভাঁজে মিশে আছে এ জেলার বিচিত্র বর্ন, ভাষা এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন আদিবাসী মানুষের বিচিত্র জীবনের ছবি ও সুর। সেই ছবি আদিমতাকে উপেক্ষা করে আধুনিকতায় উপনীত হবার, সেই সুর পৃথিবীকে নূতন করে সাজিয়ে একান্তে করে কাছে পাবার, নিজেকে প্রস্ফুটিত করার।

বান্দরবান জেলায় বসবাসরত অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে ত্রিপুরা সম্প্রদায় অন্যতম। শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জনসংখ্যার দিক থেকে মার্মাদের পরে যাদের অবস্থান। এজেলার প্রতিটি উপজেলায় ত্রিপুরারা বসবাস করে। বাংলাদেশে বসবাসরত ত্রিপুরাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বান্দরবান জেলার ত্রিপুরারা সব দিক থেকে পিছনে পড়ে রয়েছে। পিছনে পড়ে থাকার বহু কারণ গুলোর মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে এ জেলার ত্রিপুরারা অশিক্ষিত,তদুপরি দরিদ্র। অশিক্ষিত বিধায় এরা নিজেদের আধুনিক সভ্য জগতের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারছেনা, নিজেদের বিকাশিত করতে পারছেনা। ১৯৫৮ সালের আগ পর্যন্ত এ অঞ্চলের ত্রিপুরাদের মধ্যে শিক্ষার কোন আলো পৌছাতে পারেনি। এমনকি তাদের আকৃষ্ট করতেও পারেনি। ১৯৫৭ সালে এ জেলায় আগমন করে বিদেশী খ্রীষ্টিয়ান মিশন। বিশেষতঃ উপজাতীয় লোকদের কাছে খ্রীষ্টের অর্থাৎ বাইবেলের বাণী প্রচার করার উদ্দেশ্য নিয়ে বিদেশী মিশন আগমন করে। প্রচার করতে যেয়ে মিশনারীরা বেশ কিছু অসুবিধা এবং সমস্যার সম্মুখীন হন অথবা উপলব্ধি করতে পারেন যে, এ দেশের উপজাতীয়রা অশিক্ষিত দরিদ্র এবং অনগ্রসর। তাঁরা অনুধাবন করতে পারলেন যে খ্রীষ্টের বানী প্রচার করা তখনই সার্থক হবে যখন তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে বাইবেল পড়তে এবং মনে রাখতে সাহায্য করতে পারবে। মিশনারীরা প্রধানতঃ ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ রাখে। ১৯৫৮ সালে ক্যাথলিক মিশন বান্দরবান সদরে স্থায়ী ভাবে তাদের কার্য্যক্রম চালিয়ে যাবার জন্যে একটি মিশন স্থাপন করে এবং অপরদিকে আমেরিকা থেকে আগত এসোসিয়েশন অব ব্যাপটিষ্টস মিশন বর্তমান লামা উপজেলার অদূরে হেব্রণ নামক জায়গায় একটি মিশন স্থাপন করে।

ক্যাথলিক মিশন একটি স্কুল এবং হোষ্টেল তৈরী করে ত্রিপুরা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করার সুযোগ সৃষ্টি করে। প্রথম অবস্থায় তাঁরা খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি। পরবর্তীতে তাঁদের কঠোর পরিশ্রম আর প্রচেষ্টার ফলে অনেক ত্রিপুরা ছেলেমেয়ে লেখাড়ায় মনোনিবেশ করে। সেই ১৯৫৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত তাদের পরিশ্রমের ফসল স্বরূপ শতাধিক ছেলেমেয়ে এস, এস, সি পরীক্ষায় পাশ করতে সক্ষম হয়েছে। অর্ধশতাধিক ছেলেমেয়ে বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে কিংবা বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরী করছে। এছাড়া শত শত ছেলে মেয়ে বিভিন্ন গ্রাম্য স্কুলে লেখাপড়া করছে। তবুও পরিতাপের বিষয় যে, মিশন নির্ভর হওয়ায় এ জেলার ত্রিপুরারা এখনো আশানুরূপ অগ্রসর হতে পারেনি এবং পারছেনা। এ যাবত ২ জন ছেলে B. A. ডিগ্রী অর্জন করেছে, ১ জন মেডিকেল কলেজে এবং ১ জন বি, আই, টি- তে অধ্যয়ন করছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় এ জেলার ত্রিপুরাদেরও নিজস্ব ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি রয়েছে। তাদের ধর্মীয়, সামাজিক এবং পুরনো দিনের রাজনৈতিক জীবনের ধারক এবং বাহক হিসেবে এ সমস্ত সংস্কৃতি যথেষ্ট তাৎপর্য্যপূর্ন। এমন কি জাতীয় ও দেশীয় সংস্কৃতিতে এগুলোর যথেষ্ট অবদান এবং কদর রয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এগুলোকে সযত্নে লালন বিংবা সংরক্ষণ করার মত এবং আধুনীকরণ করে জাতীয় পর্যায়ে পরিবেশন করার মত কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি বিধায়এ অঞ্চলের ত্রিপুরাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এখনো অপরিচিত এবং অন্ধকারে রয়ে গেছে। তাছাড়া

কোন সংগঠক এবং উদ্যোক্তা না থাকায় এ জেলার অনেক প্রতিভাধর ত্রিপুরা শিল্পী নিজেদের বিকশিত করতে পারছেনা কিংবা আগ্রহী নয়। আমার মনে হয়ে রেডিও বাংলাদেশ চট্টগ্রাম এর পাহাড়িকা অনুষ্ঠানের পরিচালক, প্রযোজক এবং শিল্পীদের এ ব্যাপারে সক্রিয় সহযোগিতা দান করা উচিত। বাংলাদেশ ত্রিপুরা শিল্পী কল্যান ফাউন্ডেশনের পক্ষে অনগ্রসর বান্দরবান জেলার ত্রিপুরা শিল্পীদের সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে উৎসাহিত করার জন্য অগ্রনী ভূমিকা পালন করা উচিত বলে আমি মনে করি। নতুবা ত্রিপুরারা সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যেতে পারবে না।

বান্দরবান জেলার ত্রিপুরারা বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন করে থাকে। এ জেলার অধিকাংশ ত্রিপুরারাই খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী হওয়ায় ডিসেম্বর মাসের ২৫ তারিখ অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের জন্ম জয়ন্তী বড় দিনকে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে উদযাপন করে থাকে। এছাড়া যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পনরুত্থান দিবস, বিয়ে, নবান্ন উৎসব, চৈত্র- সংক্রান্তি উৎসব ইত্যাদি বিভিন্ন উৎসব পালন করে থাকে। এসমস্ত উৎসবে বিভিন্ন ধরণের নাচ- গান, কৌতুক, অভিনয় পরিবেশন করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে গরাইয়া নাচ, খেলাংফাম, কাওবেঃসাম ইত্যাদি খুবই জনপ্রিয়।

বান্দরবান জেলার ত্রিপুরারা অর্থনৈতিক ভাবে খুবই দূর্বল। জীবিকা নির্বাহের প্রধান এবং অন্যতাম উপায় হচ্ছে জুম চাষ। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতিকূলতার কারণে জুম চাষ এখন আগের মত ভাল নয়। তাছাড়া বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হয়না বা করতে জানেনা বিধায় ফসল ভাল হয়না। এ জেলার লামা এবং আলীকদম উপজেলার বেশ কিছু ত্রিপুরা জমির উপর নির্ভরশীল। নিজেদের জমি থাকা সত্ত্বেও মূলধনের অভাবে তারাও অর্থনৈতিক ভাবে সচ্ছল এবং সবল নয়। অধিকাংশ জমি বাঙ্গালী মহাজনের কাছে বন্ধক রাখতে বাধ্য হয় ফলে যা হবার তা-ই হয়ে থাকে। এ অঞ্চলের ত্রিপুরারা যাযাবরের মত জীবন-যাপন করে, তাই তো এদের আর্থিক অবস্থা খুবই করুণ। সঠিক নেতৃত্বের এবং নেতার অভাবে এদের সামাজিক অবস্থা বড়ই নড়বড়ে। ফলে অধিকাংশ ত্রিপুরারা ঠিকানা বিহীন এবং পরনির্ভরশীল হয়ে জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে অনেকের পক্ষে সামান্য বেচা-কেনা করাও সম্ভব হয়ে ওঠেনা। তবুও আনন্দের বিষয় বর্তমানে কিছু শিক্ষিত যুবক যুবতী বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরী করে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে চাঙ্গা করার চেষ্ঠা করছে। আশা রাখি আগামীতে অনেক যুবক এ ব্যাপারে আরো এগিয়ে আসবে।

পরিশেষে একটা কথা না বললে নয়। পৃথিবী আজ বয়সের ভাবে নূয়ে পড়েছে অথচ ত্রিপুরা সম্প্রদায় আজো সেই আদিমতাকে আঁকড়ে ধরে নিজেদের গভীর অরন্যের গভীর অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছে। যেখানে পৃথিবীর সমস্ত জাতি, সম্প্রদায় শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, রাজনৈতিক ভাবে, সামাজিক ভাবে এবং অর্থনীতিতে বহুদূর এগিয়ে গেছে সেখানে আমরা আজো নির্বিকারভাবে? আদিম উদোমতাকে নিয়ে দুমুঠো ভাতের জন্যে ভিন্ জাতির দুয়ারে দুয়ারে যেয়ে হাত পাতছি, অর্ধচন্দ্র খেয়ে হুমড়ি খেয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় পথের ধারে পড়ে আছি। রাখালবিহীন ভেড়ার মত যত্রতত্র ঘুরে মরছি। কিন্তু কেন? এর কি কোন সমাধান নেই? এর কি অবসান নেই? অবশ্যই আছে। এবং বর্তমান শিক্ষিত ত্রিপুরা যুবসমাজই এর সমাধান দিতে পারে। যুব সমাজ দেশ এবং জাতির মেরুদন্ড, শক্তি। সমাজ,জাতি এবং সময়ের প্রয়োজনে যুবসমাজকে সর্বদা এগিয়ে আসতে হবে। ধর্মীয় অন্ধ বিশ্বাস এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। বর্তমান নূয়ে পড়া সমাজকে শক্ত হাতে জাগিয়ে তুলতে হবে, বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জাতিকে সংগঠিত করতে হবে। এবং এখনই, আজই করতে হবে। নয়ত এদেশের ত্রিপুরারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে যাবে। ভৌগোলিক সীমা রেখা অতিক্রম করে প্রতিটি জেলার ত্রিপুরাদের একে অপরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

ইতিহাস লিখেছি তো আমরা
রাজমালা তার প্রমাণ।
লিখবো আরো হাজারো ইতিহাস।
তৈমা-র সন্তান আমরা তৈ- প্রা
থাকবো সবার শীর্ষে, সবার উপরে
হিমালয় আর সূর্য্যের সমান।

(মিঃ অসাই ত্রিপুরা চট্টগ্রামস্থ বাইবেল স্কুলের অধ্যক্ষ)

শ্রী নবীন কুমার ত্রিপুরার সাক্ষাতকার

'সান্তুআ' প্রকাশের ব্যাপারে যে তাগিদ গুলো আমাদের মনে কাজ করেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল শিক্ষাক্ষেত্রে ত্রিপুরাদের অনগ্রসরতা। এ বিষয়ে আলাপের জন্য আমরা মুখোমুখি হই খাগড়াছড়ি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক শ্রী নবীন কুমার ত্রিপুরার, যিনি এ অঞ্চলের শিক্ষাঙ্গনেই শুধু নন, সমাজের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটেও একজন পথিকৃৎ। তাঁর শিক্ষা ও কর্মজীবন সর্ম্পকে একটা সাক্ষাতকার গ্রহনে আমাদের আগ্রহ জানাতেই শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি তাৎক্ষণিকভাবে এবং সানন্দে এতে তাঁর সম্মতি জানান। এজন্য আমরা অশেষ কৃতজ্ঞ। নবীন কুমার ত্রিপুরা মহাশয় ১৯৩৫ সালে পানছড়ির লতিবানে জন্মগ্রহন করেন। নানান প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ছাত্রজীবনের শুরু থেকেই তিনি মেধার পরিচয় দেন। নিজগৃহে গৃহ শিক্ষকের নিকট হাতে খড়ি হওয়ার পর তবলছড়ি কদমতলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক চাকমা পরিবারের বাড়িতে থেকে তিনি প্রথম শ্রেনীর পাঠ নেন। এরপর ভাইবোন ছড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, পানছড়ি বিদ্যালয়, খাগড়াছড়ি জুনিয়র হাইস্কুল, কানুনগোপাড়া বিবি হাইস্কুল

রাঙ্গামাটি গভঃ হাইস্কুলে পড়াশুনা করেন ম্যাট্রিকুলেশন অব্দি। তিনি ভাইবোন ছড়া থেকে ১৯৪৩ সালে ২য় শ্রেনীতে এবং পানছড়ি থেকে ১৯৪৫ সালে ৪র্থ শ্রেনীতে পড়াকালীন বৃত্তি লাভ করেন। রাঙ্গাঁমাটি থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন ১৯৫২ সালে। আই, এ, ও বি, এ দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন কানুনগোপাড়া স্যার আশুতোষ কলেজ থেকে যথাক্রমে ১৯৫৪ ও ৫৬ সালে।

১৯৫৭ সালে খাগড়াছড়ি জুনিয়র হাইস্কুলে শিক্ষকতার পদে যোগ দেওয়ার পর শ্রী ত্রিপুরা ১৯৬১.৬২ সালে বি, এড পাশ করেন এবং তখন থেকে অদ্যাবধি খাগড়াছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে বহাল আছেন। তিনি একজন কর্মব্যস্ত মানুষ। বর্তমানে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ছাড়াও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার দায়িত্বে ভারপ্রাপ্ত রয়েছেন। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথেও তিনি যুক্ত রয়েছেন। দীর্ঘদিন যাবত তিনি খাগড়াছড়ি রেডক্রস ইউনিটের সহ সভাপতি ও জাতীয় সম্মেলনের জিলা প্রতিনিধি ছিলেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিনি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদের পরিচালনা কমিটির সদস্য। খাগড়াছড়ি কচিকাঁচার আসরেরও সভাপতি প্রথম থেকে। এছাড়া বাংলাদেশ স্কাউট, রাইফেল ক্লাব, অফিসার্স ক্লাব প্রভৃতির সাথেও তিনি জড়িত আছেন। অনগ্রসর ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন কল্পে ১৯৬৫ সালে যে কয়েকজন ব্যক্তির উদ্যোগ এবং সমন্বয়ে ত্রিপুরা উপজাতি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংসদ গঠিত হয়েছিল (যা বর্তমানে ত্রিপুরা কল্যান সংসদ নামে পরিচিত) তাদের মধ্যে শ্রী ত্রিপুরা ও ছিলেন। এসংগঠনের সহসভাপতিও সাধারন সম্পাদক হিসাবে অতীতে কাজ করেছেন বর্তমানে উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করছেন। উল্লেখ্য সংসদের একজন আজীবন সদস্যও তিনি।

সাক্ষাতকার দানে স্যারের সম্মতি পেয়ে সান্তুআর পক্ষ থেকে তাঁকে কিছু প্রশ্ন পেশ করি। এগুলোর লিখিত ভাবে উত্তর দেওয়াই ঠিক হয়। শত ব্যস্ততার ফাঁকে আগ্রহের সাথে তিনি তাঁর সুচিন্তিত মতামত, অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিচারন আমাদের জন্য উপহার দিয়েছেন। নীচে সেগুলো পত্রস্থ হল।

সান্তুআঃ *আপনার ছাত্রাবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষাব্যবস্থা কেমন ছিলো?*

ন. কু. ত্রিঃ আমরা যখন পড়তুম পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষার ব্যবস্থা অত্যন্ত সীমিত ছিল। কলেজতো ছিলইনা; স্কুলের সংখ্যা কম, সমগ্র জেলায় একটি মাত্র হাইস্কুল, তাও ভর্তির কড়াকড়ি। পার্বত্য অঞ্চলে লোকসংখ্যা ছিলো কম; যাতায়াত ব্যবস্থা ছিলো দুর্গম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল হাতেগুনা; এ গুলির দুরত্বের ব্যবধান ছিল অনেক। এই যেমন ধরুন, প্রথম শ্রেনীতে পড়ার জন্য ১০/১২ মাইল পাহাড় জঙ্গল ডিঙিয়ে আমাকে যেতে হয়েছিলো ফেনীভেলীর কদমতলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকতে হয়েছে একটা চাকমা পরিবারে। ভাষা জানতুম না,অনেক অসুবিধা, অনেক অসংগতি। তবে, মজাও লাগত খুব। লাভ ও হয়েছে অনেক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেশী না হলেও প্রত্যেক সকুলে পড়াশুনার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষকগন নিষ্ঠাবান, কর্তব্যপরায়ন ও স্নেহশীল ছিলেন। শিক্ষক পড়া আদায়ের জন্য সচেষ্ট থাকতেন। তবে এর জন্য বেত্রাঘাতই মুখ্যভ্য অস্ত্র ছিল। পড়া শিখে স্কুলে যেতে হবে এটা ছিল শিক্ষার্থীদের সাধারন ধারনা। কম সংখ্যক ছেলেমেয়ে স্কুলে যেত; কিন্তু ফেলের সংখ্যা খুব কম ছিল। স্কুলে এলেই তাকে পাশ করানো যেন শিক্ষকের একক দায়িত্ব হয়ে যায়। অভিভাবকেরা ছেলে স্কুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন। দরকার শুধু প্রয়োজনীয় খরচ যোগানো। পরীক্ষায় নকল বলতে ছিলই না। কোন ছাত্র নকল করলেও শিক্ষকের কাছেতো নয়ই সহপাঠীদের নিকটও তা গোপন রাখত। কারন, নকল করাকে সত্যিই লজ্জাস্কর অপরাধ বলে মনে করত।

প্রাইভেট টিউশনি ছিলইনা। ছেলের কাছে টাকা নিয়ে বিদ্যাদানকে শিক্ষকরা সম্মানজনক মনে করতেন না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল সম্ভাবনাময় ছাত্রদের শিক্ষকরা অকাতরে পড়াতেন। যেমন আমি চতুর্থ শ্রেনীতে পড়াকালীন বৃত্তি পরীক্ষায় নির্বাচিত হই। প্রধান শিক্ষক মিঃ বীবানন্দ দেওয়ান বেশ কয়েক মাস পুর্ব হতে আমাকে নিজের কাছে নিয়ে এসে আহার যোগিয়ে সেবাযত্ন করে নিয়মিত পড়াতেন। এ পরীক্ষা দিয়ে মাসিক ৩ টাকা হারে বৃত্তি পেলাম। সে দিনের ৩ টাকার অনেক দাম। অনুরূপভাবে দশম শ্রেণীতে মিঃ জাফর আলী খান নামক একজন শিক্ষক স্বেচ্ছায় প্রনোদিত হয়ে ১০/১২ জন ছাত্রকে অবসর সময়ে অংক পড়াতেন। সে বছর মেট্রিক পরীক্ষায় আমরা ১০/১২ জন সবাই অংকে লেটার পেয়ে প্রথম বিভাগে পাশ করেছি। তাতে ছাত্র শিক্ষক কত খুশী।

সান্তুআঃ *আপনার প্রজন্মে হাতে গুনা যে কয়েকজন লোক স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা লাভ করেছিলেন, আপনি তাঁদের মধ্যে একজন। পড়াশুনা চালিয়ে যাবার ব্যাপারে আপনাকে কি ধরনের প্রতিকূলতার মুখামুখি হতে হয়েছিল? আপনার প্রেরনার উৎস কি ছিল?*

ন. কু. ত্রিঃ আমার পূর্বে ত্রিপুরা সমাজের মধ্যে মাত্র একজন স্নাতক ডিগ্রিধারী ছিলেন। তিনি স্বর্গতঃ মিঃ বীরেন্দ্র কিশোর রোয়াজা। তিনি ১৯৩৬ সনে বি, এ পাশ করার পর দু'দশক পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে ত্রিপুরাদের বন্ধ্যাত্ব বিদ্যমান ছিল। অনেক বৎসর পরে ১৯৫৬ সালে কেমন করে আমি আমাদের সমাজে দ্বিতীয় স্নাতক হলাম সেও একটা বিস্ময় মিশ্রিত আনন্দানুভূতি।

পড়শুনা চালিয়ে যাওয়ার পথে আমার জীবনে বাধা ছিল অনেক। প্রথমতঃ আমি ৬ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হই। এবং একই সংগে মায়ের কোল হতে ছিটকে পড়ি। পড়াশুনা করার মত আর্থিক সংগতি হারিয়ে কান্ডারী বিহীন অসহায় অবস্থায় এ

ঘাট হতে ওঘাটে ভেসে বেড়াতে হয়। যার ফলে কখনো চাকমা পরিবারে কখনো মারমা পরিবারে ঠাঁই নিতে হয়েছে। দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা ছিল সামজিক পরিবেশ। পড়ালেখার জন্য উৎসাহের পরিবর্তে সমাজ সংসারের পক্ষ থেকে কেবল পিছুটান এসেছে। আত্মীয় আপনজনের কাছথেকে পরামর্শ এসেছে তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ঘর সংসার পাতবার। গ্রামের আশে পাশে কোন সহপাঠি ছিলনা। শুধু একলা চলার ডাক শুনেছি, চলতে হয়েছে। তৃতীয়তঃ ত্রিপুরা সামাজিক অবস্থা এবং অবস্থান বর্তমান কালের ন্যায় শিক্ষার অনুকূল নহে। জীবনের প্রাপ্তিকে বড় করে দেখার কোন অবকাশ ছিলো না। চতুর্থতঃ যাতায়াতের দুর্গমতা প্রকট ছিল। পায়ে হেঁটে সেই লতিবান থেকে দল বেঁধে দিনের পর দিন মাইলের পর মাইল স্কুল কলেজে যাওয়া কিছু মজার হলেও বড় দুষ্কর ও দুর্গম ছিল। তবে সমাজে ছাত্রদের একটা আলাদা খাতির ছিল। চলতে চলতে বেলা শেষে যেকোন গৃহস্থের বাড়িতে সাদর আতিথ্য মিলিত।

এত প্রতিকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও পড়ার প্রতি অনুরাগী হওয়ার উৎস বোধ হয় শিক্ষক মহাশয়দের উৎসাহ ও স্নেহ সান্নিধ্য। ভাল ছাত্র হিসাবে ছাত্র জীবনে শিক্ষকদের বড় প্রিয় পাত্র ছিলাম। বরাবরই তাঁরা সামনে এগুবার সাহস এবং আশা যোগাতেন। তাইতো পিছুটানের এত জঞ্জাল ডিঙিয়ে স্নাতকের সোপান অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছি। এটা বললে হয়ত অত্যুক্তি হবেনা বিধিদত্ত আমার মেধা ছিল বলে আমার বিশ্বাস। পড়া লেখার খুব মনযোগী না হয়েও পাঠ্য বইয়ের পড়া শিখতে তেমন বেগ পেতে হতো না। শ্রেনীকক্ষে পাঠ নেওয়া দেওয়ার মধ্যে সহজে শিক্ষকের সহানুভূতি আকর্ষন করতে সক্ষম হতাম। আপসোসের কথা স্কুল পর্যায়ে লাইব্রেরীর বই বা দৈনিক সাময়িকী পড়ার সুযোগ কদাচিৎ ঘটত। কলেজ পর্যায়ে গিয়ে বই পত্র পড়ার সুযোগ লাভ করি এবং দেশ দুনিয়া সর্ম্পকে ওয়াকিবহাল হয়ে শিক্ষার প্রতি সত্যিকারের অনুরাগ জন্মে।

সান্ত্বআঃ *গত পঞ্চাশ বছরে ত্রিপুরা সমাজে শিক্ষার প্রসার কতটুকু ঘটেছে, এ ব্যাপারে আপনার মূল্যায়ন জানতে আমরা আগ্রহী। শিক্ষাক্ষেত্রে ত্রিপুরাদের বর্তমান অনগ্রসরতা দূরীকরনে কি কি বাধা আছে এবং সে গুলো কিভাবে দুর করা যায় বলে আপনি মনে করেন?*

ন. কু.ত্রিঃ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ভারত বিভক্তির আগে ত্রিপুরারা প্রায়ই জুমচাষী যাযাবর ছিলেন। সমগ্র লোকসংখ্যার অতি নগন্য শতাংশ জমি জমা দখল করে স্থায়ী বসবাসে সূচনা করেছিলেন। সেদিনের তুলনায় বর্তমান শিক্ষিতের হার অবশ্যই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, গানিতিক পরিসংখ্যান দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ত্রিপুরা অধ্যুষিত আভ্যন্তরীন গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। উচ্চ বিদ্যালয় গুলোও প্রায় নাগালের মধ্যে এসেছে। অল্পে তুষ্ট থাকার কারনে যে চাকুরী জীবন আমাদের সমাজ প্রত্যাখ্যাত ছিল এখন তার মোহনীয় আকর্ষন আমাদের যুবসমাজকে মোহিত করেছে। এবং এই সোনার হরিনের তাড়নায় পরীক্ষা পাশের চেষ্টায় ত্রুটি হচ্ছে না। লেখা পড়া জানা লোকের সংখ্যা বেড়েছে। তৎসত্ত্বেও সন্দেহ জাগে এতে সমাজের অগ্রগতি হচ্ছে কি না ? "আত্মানাং বিদ্ধি" "ভূমাকে উপলব্ধি কর" "মানুষের মঙ্গলে ব্রতী হও" এরূপ বিশ্বাস শিক্ষার্থীদের মনে জন্মাতে না পারলে শিক্ষার সুফল লাভ করা কঠিন। ভাঙ্গনের মুখে সমাজ আজ দোদুল্যমান। অর্থনীতি সংকট অতীব প্রকট। নব চেতনায় দীক্ষিত যুবকেরা শিক্ষা গ্রহনে আগ্রহী হলে ও অর্থের অভাবে সংকল্প সাধনে পিছপা হচ্ছে। কোথাও কোথাও অতি আধুনিকতার চমকে যুবশ্রেনী বিভ্রান্ত হচ্ছে। তাই তাদের সংযত, সহনশীল, আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে নৈতিক শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। এই উভয় উদ্দেশ্য সাধনে ত্রিপুরা কল্যান সংসদ অগ্রনী ভূমিকা পালনে আন্তরিক উদ্যোগ নিতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। অবশ্য আমার এ মতামতের সমর্থনে আরো সুদীর্ঘ ব্যাখ্যার অবকাশ আছে।

সান্ত্বআঃ *কেন আপনি শিক্ষকতার পেশা বেছে নিয়েছিলেন? একজন শিক্ষক হিসেবে আপনার জীবনের সবচেযে কঠিন চ্যালেঞ্জ কি ছিল? কিসে আপনি সবচেয়ে বেশী সাফল্য বোধ পেয়েছেন?*

ন.কু. ত্রিঃ শিক্ষকতার পেশা বর্তমান কালে বাহ্যিক দৃষ্টিতে আদৃত নহে। তবু এ পেশাকে জীবনের অবলম্বন হিসেবে নিয়েছি। শিক্ষকতার প্রতি আসক্তি বোধ করেছি ছাত্র জীবনে। কতিপয় সক্ষম শিক্ষকের পাঠদান ও নেতৃত্ব আমাকে এত প্রভাবান্বিত করেন যে মনে মনে বলি ভাবষ্যতে একজন শিক্ষক হব।

ছোটবেলা থেকে পারিবারিক বিপর্যয়ের কারণে অনেক দুঃখের সহিত আমাকে মোকাবিলা করতে হয়েছে এবং সমাজের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের সুযোগ হয়েছিল। চারিপাশে মানুষের দীনতা, অজ্ঞতা দেখে এমন একটি ধারণা জন্মেছিল সুযোগ পেলে এদের হয়ে কাজ করব। পেশাগত জীবনে শিক্ষকতা ছিল সবচেয়ে সহজলভ্য। তাই বি, এ পাশ করার পরের বৎসরেই শিক্ষাকতায় যোগদান করা হলো। পাঠদানে আমার বড় আনন্দ ও পাঠদানেই নিজকে সফল বলে মনে করি।

সান্ত্বআঃ *আপনার পরিচিতি খাগড়াছড়ির একজন অগ্রনী শিক্ষাবিদ হিসাবেই নয়, ত্রিপুরা সমাজের তথা পার্বত্যাঞ্চলের সকল অধিবাসীদের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাগ্যোন্নয়নের কাজে আপনি দীর্ঘকাল সক্রিয় আছেন। এই প্রেক্ষাপটে আপনার দীর্ঘকাল কর্ম জীবনের কিছু শিক্ষনীয় অভিজ্ঞতার কথা বলুন।*

ন. কু. ত্রিঃ আমার সক্রিয় কর্মগন্ডী মুলতঃ স্কুলের ছকে বাঁধা। বাকীগুলোতো optional. ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদের কাজ করার সুযোগ ঘটেছে। জীবনে সাফল্য আমি দুটো ক্ষেত্রেই অর্জন করেছি। খাগড়াছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে আমার ভূমিকা ছিল। বেসরকারী থেকে সরকারী স্কুলে রূপদানের কাজে প্রতিষ্ঠানের হাল দীর্ঘদিন যাবত ধরে যে ঘাটে এনে ভিড়িয়েছি তা অবহেলার নয়; প্রশংসার বলে মনে করি। আর ত্রিপুরা কল্যান সংসদের সেক্রেটারীর দায়িত্বে কাজ করে তাকে মোটামুটি শক্ত ভিত্তিতে খাড়া করেছি। যাক্ সাফল্যের ক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে কাজে আন্তরিকতা, মন প্রান দিয়ে কাজে ডুবে থাকতে পারলে স্বার্থবুদ্ধির মাদকতা আসতে পারে না। চেষ্টা নিঃস্বার্থ হলে সাফল্য প্রায় অবশ্যম্ভাবী। স্কুল এবং সংসদ উভয় ক্ষেত্রেই তার প্রমান মিলেছে। কথায় বলে "ডাকার মত ডাকলে ভগবানের ও আসন টলে" । আর ভালমন্দের আসরে নিজেই শ্রেষ্ঠ বিচারক। যে কোন বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে বিবেকের অনুশাসন পাওয়া যায়।

আমাদের অনেক কাজে সাফল্য আসেনা। তার কারণ আমরা স্রোতে গা ভাসিয়ে দিই। সকলের সংগে সুর মিলিয়ে অনেক বলা বলি, লাফা লাফি করি। ভাবটা এমন "আমি কত দরদী কর্মী"। আন্তরিকতা বা মৌলিকতা নেই বলেই ফল হয় "পর্বত মূষিক প্রসব"। তাই সাফল্যের জন্য কর্মপাগল দরদী মন চাই।

সান্ত্বআঃ *শীঘ্রই আপনি চাকরী থেকে অবসর নিতে যাচ্ছেন, ত্রিপুরা সমাজের সার্বিক উন্নয়নের কাজে সামনে আপনাকে আরও সক্রিয় দেখতে পাব বলেই আমাদের প্রত্যাশা। আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়ে কিছু বলবেন কি?*

ন. কু. ত্রিঃ অবসর গ্রহনের জন্য প্রতিনিয়ত মানসিক প্রস্তুতি নিতে চেষ্টা করছি। বর্তমানে সরকারী চাকরীর কাজেও বাইরের যোগাযোগ রক্ষায় এত ব্যস্ত থাকি অবসর গ্রহনের পরদিনগুলি কিভাবে সদ্ব্যবহার করতে পারি তা কল্পনা আর বাস্তবে কতদূর ব্যবধান বা মিল হবে ভেবে রোমাঞ্চিত হই।

নিরিবিলি প্রকৃতি কোলে বাসগৃহ নির্বাচন করেছি। বইপুস্তক পড়ে, হাস মুরগী, গরুছাগল প্রতিপালন, মৎস্য চাষ, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প পত্তন, বাগান ও গাছ গাছালি পরিচর্যা বাকী কর্মজীবনকে সংযত ও সীমাবদ্ধ রাখব ভাবছি। আদর্শ খামার জাতীয় কিছু করে গ্রামবাসীকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করা হবে। Occupational change কিছু আনতে না পারলে এ লোকগুলোকে বাঁচিয়ে রাখাই দুষ্কর হবে।

দু' চারটা দোকান বেঁধে ব্যবসা পত্তন করে কিছু লোককে ব্যবসায়ে লাগানোর ইচ্ছে আছে। এ পেশাতে কাউকে অভ্যস্ত করতে পারলে লাভ হবে অনেক।

ইদানিংকালে ত্রিপুরা ছেলেদের জন্য একটি অনাথ আশ্রম খোলার কথা হচ্ছে। দায়িত্ব অর্পিত হলে তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য অকৃত্রিম চেষ্টা করার আশা পোষন করি।

সান্তুআঃ *ত্রিপুরা ছাত্রসমাজ ও তরুনদের প্রতি আপনার কোন উপদেশ, প্রশংসা, সমালোচনা আছে কি?*

ন. কু. ত্রিঃ ছাত্রসমাজ ও তরুনরা আমাদের মূলধন। তাদের মনে মহৎ আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করতে পারলে সমাজের মুক্তি আসবে। কিন্তু, কিভাবে তা করা সম্ভব, সে পথের সঠিক সন্ধান দেয়া দুরূহ। কর্মীর অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হয়। কিছু কিছু সংস্কার মুক্ত গঠন মূলক চিন্তাধারা ছাত্র সমাজে দেখা গেলেও মনে হয় সক্রিয় সমর্থনের অভাবে তা বিকশিত হয়ে উঠে না। ত্রিপুরা ছাত্র সমাজে মতৈক্যের অভাব আমাদের পক্ষে বিব্রতকর। তাদের সংগে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বাঞ্চনীয়।

–সাক্ষাতকার গ্রহনে প্র. ত্রি.

বীজের আত্মকথা

সালকামৌং ত্রিপুরা

জানে বীজ, কঠিন মাটি ভেদ করে
তাকে জন্ম নিতে হবে।
তবু, সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
জানে চারা, সারা দিন রাত
রৌদ্র আর ঝড়ঝঞ্জার চাবুক
খেয়ে খেয়ে বড় হতে হবে;
তবু, সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
তবুও চারা সমস্ত রকম
নিপীড়ন নির্যাতন সহ্য করে
গাছ হয়ে ফুল দেবে, ফল দেবে
হাজার হাজার গাছের জন্ম দেবে।
বীজ তাই কঠিন সংগ্রাম করে
রেখে যেতে চায়–
যা অবিনশ্বর
যা ধ্বংসের আগে সৃষ্টি করে যায়।

নাইসিঙই তঙজাগ

গীতা দেববর্মন

অসীক সাল যে বীখীরীই
পের–নহিনই আঙ নাইসিঙই তঙখা
নীঙ আনি অ বীখীরীইনি খুমবার।
জতনি বাখানি ককন' লাগই
রাচাবন' নীঙ, অরই
লারীগই তঙখা বাখানি কক
আনি, বানা নিনি বাগই।
যেসীক মাচায়া, মানীঙয়া, মাকানয়ারকন'
নীঙ খানার–নআশানি কক
হুঅই রন জতনি মকল মীকতীই
ফুনুকন' পর সাকাঙলি সালকীতাল।
নীঙ আনি অ এমাঙনি বরক।
নীঙ আনি অ নাইসিঙমানি তঙমুঙ।
যে তঙমুঙ কাখীরাঙ, মাচাঙ, কীথার
নীঙ আনি অ হায়কমানি সাল।
আী বিসি কীতাল
নিনি অর' নাইঅ আঙ মাতাইনি বীরদা।

ঘোষণা

ত্রিপুরা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নকল্পে একটি সংগঠন গড়ার লক্ষ্যে "সান্তুআ আহবায়ক কমিটি" আগামী অক্টোবর মাসে খাগড়াছড়িতে একটি সম্মেলন করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এই সংগঠনের প্রাথমিক লক্ষ্য হবে গবেষনা, আলোচনা, প্রকাশনা প্রভৃতির মাধ্যমে ত্রিপুরা সমাজের সার্বিক চিত্র তুলে ধরা। পরবর্তীতে কিছু পরীক্ষা–মূলক উন্নয়ন প্রকল্পও হাতে নেয়া হবে। অক্টোবর সম্মেলনের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন; – প্রশান্ত ত্রিপুরা, খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি; শক্তিপদ ত্রিপুরা, ৩১০, শাহ্ আমানত হল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

লেখা আহবানঃ 'সান্তুআর' আগামী সংখ্যার জন্য ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে উপরের যে কোন ঠিকানায় লেখা পাঠানোর অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। বিশেষ করে নবীন লেখক লেখিকাদের লেখা পেতে আমরা খুব আগ্রহী। ত্রিপুরা সমাজের বিভিন্ন সমকালীন প্রসঙ্গে লেখা প্রবন্ধ ও ককবরকে লেখা গল্প, কবিতা প্রভৃতি প্রাধান্য পাবে।

'সান্তুআর' প্রথম সংখ্যার উপর পাঠকদের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ কামনা করি।